টাঁড় - বাহালের বিনোদিনী

জগন্নাথ ঘোষ

সাঁঝে ফুটা ঝিঙা ফুল

ডিসেম্বরের ঠান্ডা নেমেছে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে। কুয়াশার হাল্কা ঢাকনায় আবছা পাহাড়, জঙ্গল। নীচের গ্রামগুলিও পাতলা ওড়নায় ঢাকা। অযোধ্যার মোড় থেকে রাজসড়ক ধরে খানিক এগিয়ে ডান দিকের মোরাম পথে কিছুটা গেলে মাদলা গ্রাম। সেই গ্রামের শেষ প্রান্তের কাঁচা ঘরটিতে আমরা আড্ডা বসিয়েছি। সময়টা, সন্ধ্যা উতরে গেছে। একটা দশ ফুট বাই আট ফুট ঘরে কুপি জ্বলছে। তার ঘসা আলোয় দেখা যায় দুটি ধূসর মুখ। তারা ছেঁড়া মলিন ধোকড় জড়িয়ে পাশাপাশি বসা। নাচনি **দুলি মাছুয়ার,** এবং তার রসিক **জিতু মুড়া।** দুলির শরীরে মধ্য বয়সের দাঁত বসেছে। তার ক্ষয়িত যৌবন, স্খলিত চলন, কিন্তু স্ফুরিত চাহন। পাশের মানুষটির ষাট এর কোঠায় বয়স। স্বভাবে বাউরা, অভাবে সংসার। সংসার বলতে এই দুই জন। ঘরে 'জাইতালু' বই (বিবাহিত স্ত্রী'? জিতু হাসে। বলে—উঁয়ারও বিহা নাই, হামারও বিহা নাই। দুটাতে দলবদ্ধ রঁহে গেঁলি সকল জীবনভরটা। আর রাঁহিলি কারণসুধা, বলে সে মহুল রসের বোতলটা তুলে ধরে। পাড়ায় নাচনি ঢোকালে, গ্রামের ষোলআনায় কথা উঠল না? হামাদেরকে আঠারো আনার পিরিত, যুলো আনা কি বুঝবেক। সে একখানা ভবপ্রীতার ঝুমর দেয়— 'সঙ্গে যত সহচরী/ মাঝেতে কে সোঁন্দরী/ তারে হেরি পরাণ উথলা....।' ভাবের ঘরে মানুষটা বলে, তখন হামার জিলি (কচি) উমর। শ্রাবন্ডি গাঁয়ের শশ মাহাত উস্তাদ ঝুমরিয়া। দমে পদ রচেন, গাহেন। তিনি রসক্যাও কঠিন। তাহার ঘরকে নিত্য যাওয়া হঁচ্ছেন আমার। তাহার দুটা নাচনি শারদা আর গরহা। পুঁতলি পারা দুলিকেও লুঠে আনলেন। শারদা আর গরহা দুটাই কাল সর্প মহাশয়। গরহার সর্বাঙ্গ অগ্নি শিখা, শশ তাহাতে দহন হঁচ্ছেন। তিনি ধ্রুপদী গান বাঁধেন। নাচনিরা নাচেন তালিম নেয়। দুলি তখন ঝিঙা ফুলট। জিতু মুড়া হাসে। তাহার কণ্ঠ শুনি নাই। রূপটি ভাল্যেছি (দেখেছি) একদিন, সাঁঝের বেলা শহর গৃহে। গগনে চন্দ্র উদিত হঁয়েছেন। তাহার মিঠা আলয় টাঁড়ের ধারে কলিটি ফুটেছেও হামি দেঁখলি। তখন বয়স কত দুলির? প্রশ্ন করি। জিতু বলে, বয়সের তো হামার কন বুঝ-বিচার নাই বাপ। কালি - বিদ্যা নাই। কলি বলব্য। বুঝা কর দেহখানায় তাহার মধুমাসের সৈতন বাতাস লাঁগেছে। নারী অঙ্গের নব বিলাস পূর্বে কখন ভালি নাই রে বাপ্। হামার মাথায় ঘুঁরাও গেঁলি। শশর ঘরকে যাই। আর কতক গাহনদার আসেন, রসক্যা আসেন। ঝুমরা চাঁচা দমে চলছ্যে। একদা ভবপিতার (ভবপ্রীতানন্দ) পদ শুনলি একটি। দুলি গাঁথেছিলি, আড়াল হঁথ্যে শুনলাম — 'পলমাত্র অর্দশনে/ বিরহ উদয় মনে/ কুসুম শরে দহে মদন হে।' পঞ্চাশোর্ধ্ব দুলি শরমে মুখ ঘুরায়। প্রায় ছত্রিশ বছর অতীতের এক স্মৃতি খুলে যায় চোখের সামনে। সিরগি গ্রাম। বিস্তৃত ডাঙার মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকা এক গ্রাম। মাথার উপরে আদিগন্ত আকাশ। ওই দূরে পাহাড়ের ছায়া। মরু - ডাঙা ভেঙ্গে ভেঙ্গে জীবন প্রবাহ। প্রখর গ্রীষ্মে, প্রবল বর্ষায়, প্রচণ্ড জাড়ের দিনে সে জীবন যে কি ভাবে চলে! সেই মরুতে একটি ফুল ফুটেছিল। ইট - পাথর পরাস্ত করে নরম পাপড়ি মেলেছিল দুলি নামের কুসুমটি। এক দিনের ঘটনা। দুলি তখন তের বছরের কিশোরী। সন্ধ্যার মুখটায় ওই পথে চলছিল শত মাহাত সপারিষদ। কিশোরী গাইছল ঝুমর — 'ঘরেতে গুরুজনা কহিলে না শুন মানা/ দিন সন্ধ্যা কর আনাগনা/ সব্বনাশে ডাবালে আমায়/ কি কবি তুমায় নাগর হে!' শশর চরণ থমকায়। সে যে জাত রসিক। পদ রচেন, গান গাহেন। তাকে মর্যাদা দেন বড় বড় মান্কির (কয়েক গ্রাম নিয়ে এক মান্কি) মাথা থেকে বাঘমুণ্ডি, মাঠার রাজাও তার ঝুমরের দৌলতে। শশও বিলক্ষণ জানে এই দুস্তর মানভূমে কোথায় কতটুকু রসের ধারা। কিন্তু এমনটা তো তার শোনা নাই। সে শুধায় — কে গাহে এমন চিকন কণ্ঠে গুরুচরণ? সাগরেদটি মৃদু গলায় বলে—ঠাকুর, সুকু মাছুয়ার বিটিট। কন সুকু? উপর সিরগির? দোলগোবিন্দু বলে—ঠিকেই বলেছ। সবরদরা উয়াঁর মা লাঁগছ্যে। সবরদরা নাচিন কি? শুনি নাই থ। দোলগোবিন্দ ইতঃস্তত করে। শশ বলে উয়াঁখে লিঁএ চল। গুরুচরণ বলে তা হল্যে থ সুকুকে টুকু সুধাতে লাগব্যে। গর্জে ওঠে শশ মাহাত— হামি বলছি, উয়াঁকে, উয়াঁকে লুঠে লিঁয়ে চল সাবন্ডি (শ্রাবন্ডি) গাঁয়ে। পুলিশ পল্টন শশ বুঝে লিঁবে। বস্তুত তাই। দেশের রাজা যার কাছে নতশির, প্রশাসন তাকে ছোঁয়, সাধ্য কি। দুলিকে প্রশ্ন করি, ঘর থেকে জানতে পেরে থানা - পুলিশ হল না ? দুলে বলে হল, সকলই হল। উয়াঁরা হামাকে ঘর - আটক রাখল। হামি পালাবার ফন্দি নাই খুঁজলি। সারদার সঙ্গে নাচ গানের তালিম নিই। দেখলম রসক্যাটিও ভালমতন লঁক।

দুলি রয়ে গেল শশর ঘরে। ইতিমধ্যে গরহাকে কুচক্র করে হত্যা করা হয়েছে। একেই তার রূপের ছটা, তায় নাচ গানের পারদর্শিতা। টাঁড় - বাইদে অমন একট কুসুম পারা নাচনিকে বাগাতে ভিন পরগনার রসক্যার চক্করে পড়ে মরতে হল গরহাকে। শশর গৃহের তখন মানসভুঁইয়ের তাবড় রসিকজনের যাতায়াত। ফকির মুড়া, লালমোহন কুঁইরি, হাড়কুমড়ার বিশ্বনাথ, মাদলার জিতু মুড়া। ওরা দেখল দুলি নাচনিকে। নাচ দেখল, গান শুনল। বন্দী সীতাকে ফন্দি করে জিতু একদিন মাদলায় এনে তুলল। চোদ্দ বছর বয়সেই দ্বিতীয়বার লুঠ হল দুলি মাছুয়ার। সেই থেকে তার জীবন ধারার বদল ঘটল। শশ পারেনি জিতু মুড়ার জীবন থেকে দুলিকে কেড়ে নিতে। দুলি বলেছিল - হামার পয়াল রসিক শশ মাহাত। ত্যাখন কুসুমট ফুটি ফুটি। জিতু হামাকে ফুটালি। সকল রকম ভোগ- উপভোগের শিক্ষা হামার এ্যাই রসক্যার হাথেই। দুলি লাজুক হাসে। জিতু মহুল মদের বোতলখানা তুলে ধরে ঢক্ঢক্ পান করে খানিক উগ্র রস, তারপর ঘোর লাগা চিত্তে ঝুমর দেয় একখানা —'মনে হয় অঙ্গে অঙ্গে/মিশায়ে হই একাঙ্গ/ সঙ্গ ছাড়া না হব কখন হে/ ভবপিতা কহে রাধা/ তুমি যে শ্যামের আধা/ অভেদ মুরতি দুইজন হে।' দুলি মিটিমিটি হাসে। বলে জিতুটা হামার রসের লাড়ু দেখছ্য বটে। সারাটা জীবন কত বৎসর, জানি নাই তো বাপ! অত আখড়া, আসর। জমিনদার, মান্কি সর্দার, মানভুঁইয়ের দর্শকজন দুলির বুকে গেঁথে দিল দশের নোট,

বিশের নোট। বস্ত্র দিল, পমেটম, হিমানি, বিলাইতি রস। আর ভালোবাসা? দুলি ফেরে তার যৌবনের বাগিচায়— হঁ দিয়াছিলেন, ঘাটবেড়ার একটা মুড়া সর্দার। তাহার ঘরকে বিটিছিইল্যা ছিল। কত অর্থের লালচ। সর্দারের গাই কাঁড়ার অগাধ সম্পদ। নাই ষাঁলি। হামি যে মদনে মাজলি হায়! দুলিও কম যায় না। রসক্যার হাত থেকে রসের বোতলটি কেড়ে নিয়ে গলায় ঢালে। অনেকটা দারু পান করে মুখ মোছে। কটা বুট কড়াই মুখে ফেলে বলে পিরিত কি জান বাপু? সর্পের দংশন। জ্বলন আছে গরলের, তথাপি এক তারাল বাসাল দশা হে। কি বউঝাব! এত বয়স পাঁইরালি কেহ কাহাকে ছাড়থ্যে লারল। আমি বলি সারা জীবন এক সঙ্গে থেকেও তোমাদের পরস্পরের প্রতি কেন এতো দূর্বার টান? ভালোবাসার রসায়নটা আমার জানতে আগ্রহ হয়। দুলি বলতে চায় সেটাই তো রসিক - নাচনির প্রেম রহস্য। আমার রসক্যাটাতো কম বড় 'বর্ণিমাকারী' (রচনাকার) ছিল না। ওর পিছনেও নাচনি ঘুরছিল, কিন্তু জিতুটা আমাতেই মজল। দুলিতেই উয়াঁর সমাদি হল্য। সে নরোত্তম দাসের একটা ভণিতা দেয়—'মধুমান আইল গ সে মধুমাসে/ পরাণ কাঁপিছে মম মদন তরাসে।'

অনেকটা রাত - বাড় হয়েছে। কুয়াশায় পথ যেমন আবছা, শিশিরে পথ সিক্ত। কুটির থেকে বেরিয়ে দেখি আঁধারে, শিশিরে আর কুয়াশায় জড়ান এক রহস্যময় মানভূম পট। পাড়াটা নিঝুম। শুধু জেগে আছে গ্রামের শেষ প্রান্তে মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে দুটি অচ্ছুৎ জীবন! যারা অন্তত একটা রাতের মদ - ভাতের অনায়াস ব্যবস্থা করে ফেলেছে, তাই যারপরনাই খুশি।

টাড় - নাগিনীর পাঁচ কহানী

প্রকাণ্ড এক ব্রহ্মডাঙ্গা। দৈর্ঘ্যে - প্রস্থে বিশ মাইল তার আয়তন। মাথার উপরে আসমানটাও ততটাই ছত্রাকারে। তার বুকের মাঝে এক ঘুমন্ত রেল স্টেশন — সুই সা। লাপাং গ্রাম থেকে নজর যায় না। লোকে বলে ওই যে ধু - ধু, উয়াঁর অন্তরে সুই সা। বাংলার শেষ স্টেশন, তারপর ঝারিখণ্ডা। হাঁটা পা - এক চলাচল এদিকে। অর্থাৎ পরিবহনের সুযোগ নিতে চাইলে রেলের দূরত্ব পাঁচ ক্রোশ, রোডের ব্যবধানও তাই। নাচনিদের বাসভূমি কতক পুরুলিয়ায়, কতক ঝারিখণ্ডের রাজখরসোঁয়া, চাণ্ডিল, সিল্লি, কোটশিলায় ব্যাপৃত। আমরা লাপাং-এ এসেছি রসিক বৃন্দাবন সিং সর্দারের খোঁজ পেয়ে, এবং বসেছি এসে তার ঘরের সামনে রহড়া গাছের নীচে, আড্ডায়। সেই আড্ডার মধ্যমণি অবশ্যই বৃন্দাবন সর্দার— এক কালের গুণধর রসিক। সে ভি ছিল বর্ণিমাকারী, অর্থাৎ ঝুমর পদকর্তা। লিখেছে লীলা ঝুমর, উদাস্যা, টাঁড় ঝুমর। আকাশের এক প্রান্তে ঈশানী মেঘের টুকরো দেখা যায়। তার মধ্যে ঝঞ্ঝার বীজ থাকলেও আপাতত তার সম্ভাবনা নেই। সর্দার চারপায়িতে বসে আছেন। শরীরখানা তার কঞ্চির মত চিকণ। অস্থির উপরে চামড়ার আচ্ছাদন শুধু, অর্থাৎ স্পষ্টতই অসুস্থ। কিন্তু অতীত কালের গল্পে সত্তরের শরীরটা তার ষোলআনা টগবগে। সর্দার বলে —সেবারে গামারিয়ার রসিক এসেছে ভেক ধরে, আমার নাচনিটার নাচ দেখতে। শুনলাম ওকে লুটে নিতে তৈরী হয়েই এসেছে। সঙ্গে লাঠিয়াল আছে। আমিও বেন্দা সর্দার। লাঠি ঘুরালে পাঁচ লঁক বেঁহুশ।

সেবারে গামারিয়ার রসিক পালাল। পরে চাটু হাঁসায় আসরে আবার দেখা। আমার হাতে একমাত্র অস্ত্র **গুলিয়া কালিন্দী,** আমার নাচনিটা। সে আসরে উঠে দমে জমিয়ে দিল। আমি ধরলাম একটা ভবপ্রীতা। 'বিষম কুসুম শরে দহিছে মদনে/ যদি বল শ্রীমতী আছেন অভিমানে/ সাধিব ধরিয়া তাঁহার যুগল চরণে।' আমার গানের পিঠে গুলিয়া জুড়ল— 'ভাবি শ্যাম তনু/ দহিছে অতনু/ তন যায় যেন জ্বলিয়া।' গান শুনে আসরের ভদ্রজন উঠল উত্তেজিত হয়ে বলে আরো চলুক। টগর মালা ছোড়ে, খুচরা পয়সা উড়ছে, নোট ভি লাগাল বুকে। খপর পাঁলি মামরিয়া রসিকটা পঁলাঞ গেঁলি। বৃন্দা সর্দার তার শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ করে গলা চড়ায়— 'হইল অবশ বসন্তে রাধা/ চিত্তে চিন্তা চিন্তামণির সদা/ হইল জর জর কামে কামিনী কৃষ্ণ - বিহরে রহে না জীবন...।' রহড়া বৃক্ষের ছায়ায় আসর জমে ওঠে। ঘর থেকে এসে পড়ে মাদোল, পেপটি। উচক্কা ছোকরা ঝুমরের পদ শুনে পুকার দেয় — রাদে, হে...রাধে! শুলিয়া মিটি মিটি হাসে। তার চোখ দুটি অশ্রুতে টলটল। মনে পড়ে পিছনের সেই দিনগুলি। আসর পড়েছে কারবাইডের আলোয়। লোকের মাঝে মঞ্চ করে সেই আসরে নাচতে নেমে প্রথম দিনে কিশোরী শুলিয়া গুটিয়ে যায়—হাই বাপ! এত্তগুলান লঁকের মাঝে আসর জাগাব। নাচে পা বুঝ না পাঁলে পিটাই খাব। রসক্যা বুঝায়— তু শিল্পী, নাচথে লসময় আগু পেছু ভাবথ্যে নাই। বৈঠকে ফ্লুট ধরে, জোড়া নাগরায় তাল পড়তেই গুলিয়ার পা নেচে ওঠে। সর্দার ধরল একট বরজুরাম (বরজুরামের ভুমজ)— 'পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী যেন কালফণী/ দংশিল আমার হিয়ায়.../ সখি বল্ না বারি লিঁয়ে কে বা যায়!' শুলিয়া কালিন্দী সত্যিই এক নাগ কন্যা তখন। ফণা উচান ভুজঙ্গ। কালো কেশে সিমল ফুলট। পমেটম, আতরের গন্ধ, জরির চকমক বস্ত্রে নাচে ভুজঙ্গ। তোলপাড় রজনী। মানভূম মৃত্তিকায় এক নতুন নাচনির জন্মকথা। জোতদারের এক খেপা নবাব ছুটে গিয়ে মঞ্চে উঠে একটা দরের নোট গুলির বুকে গেঁথে দেয়। কি লাজের কতা বটে! হামার রসক্যাট রগড় ভালছ্যে। জীবনের প্রথম মঞ্চেই অর্জিত সম্মাননা নতুন যৌবনের হাত থেকে। রসক্যা ধরেছে পীতাম্বর দাস— 'কালো অঙ্গে স্বর্ণ আভা, অপরূপ হবে শোভা/ খেলে যেমন ক্ষণপ্রভা নবীন মেঘের কোলে।' দুন্দুভি বাজে, রেটকি বাজছে যুথ করে। গুলির তখন মনে থাকে না। সামনে অগনিত জনতার দরবার। তাদের চাহতা, কাম দৃষ্টি, প্রেম নজর, অন্তরে রিপুর নহরের খরস্রোতা বহতা। সে নাচে লীলায়িত ছন্দে, মন প্রাণ ঢেলে। আমরা জব্দ বসে শুনি। গাছের ছায়ায় বসে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই পনেরোর এক তরুলতায় প্রথম মুকুলটির উন্মেষের সেই লগ্ন - কাল।

নাচনি, রাখিনি, আর বাঈ - খেমটা, তিনটায় প্রভেদ আছে, কথাটা জানতে হবে। বৃন্দাবন সিং সর্দার বোঝায়। নাচনি রসক্যার সম্পদ, জনগণের বিনোদন দান করেন। তিনি নাচে গানে প্রেমে জগৎ ভুলান। উয়াঁর সহিত কাহার তুলনা নাই। তাহারা সংসারে আসেছেন আনন্দে বিঁতাথে। বুঝলেন ভাষণটুকন। জমিনদার - নাচনি জমিনদারের সম্পদ। লেপের উপ্রে রেশমী আভরণ। দেখত্যে সোঁদর, কদর নাই। কণ্ঠ নাই। রাজা, মান্কি, ভুঁইদারকে মজালি। বাহিক ফটক নাই উয়াঁর। শুধু রাজ দরবারের শভাবর্ধক। তাহাকে রাঁখথ্যে রাজকোষ একদিন নিসার হঁয়েন যাবেক। তথাপি রাখনিট পোষ মানবেক নাই। রাজাখে ফকির কঁরে অন্যত্র পিঁজরায় যাঁঞ বসবেক। বাঈ-খেমটার চলনের কন বিচার নাই। লাজ বতর নাই। উড়াখুড়া জীবন উয়াঁদেরকে। মেটা রংয়ের ঢোল - ধামসার নাচনদার। ওদের

তিন পর্যায়ের জীবনেই আছে চরম যন্ত্রণা। যে রসক্যাটির ঘরে আছে স্ত্রীলোক। সেখানে নাচনির জন্যে পৃথক ব্যবস্থা। নাগরটির ঘরে তার জলচল নাই, গৃহস্থালিতে ভাগ নাই, ঘরের আর পাঁচ লোকের সঙ্গে সম্পর্কে কপাট বন্ধ। গৃহপালিত প্রাণীর মর্যাদায় সে। রসিক তার নাচনির শরীর, স্বাস্থ্য, শিল্পকে 'কন্ডিশনে' রাখতে যথাক্রমে অন্ন বস্ত্র মদ্যর অভাব রাখে না ঠিকই, কিন্তু আসর থেকে উপার্জিত অর্থের নাচনির কোন ভাগ থাকবে না। সে তো বিনোদন যন্ত্র মাত্র! সারা জীবন ধরে তার উপার্জনের সবটাই রসিকের হাতে তুলে দিয়ে মৃত্যুর পরে, কোন ঘাসি সম্প্রদায়ের হাতে তার মৃতদেহের সৎকার হবে। সে ব্যক্তির দেহটি পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে শ্মশানে ফেলে কাঠের অভাবে টায়ারের আগুনে পুড়িয়ে দেবে। অর্থাভাবে মাটি চাপা দেবে। রাত্রে কুকুর - শৃগালে মহাভোজ হবে নাচনির পচাল লাশে। তার জন্যে অশ্রুপাতের কেউ নেই যে! একমাত্র ভাবের ঘরে রসিক ব্যতিরেকে। তার ঘর যে আঁধার হল। সে নিভৃতে বসে কাঁদে। নাচনি তার পিতৃ-মাতৃ পরিচয় তো গৃহত্যাগেই মুছে দিয়ে এসেছে। ভাই - বোন পরিজনহীন একা, একতন্ত্রী হয়ে চলা একটা ফুটো - ফাটা তরণীর সারাটা জীবন এঘাট-ওঘাট হতে হতে, এভাবেই আত্মপরিচয়হীন ডুবে যাওয়া একদিন!

নাচনি রাখতে গিয়ে রসিক তার জমি, হাল, গাই, কাঁড়া (মহিষ) পর্যায়ক্রমে বিক্রি করে ফতুর হয়ে গেছে এমন ঘটনা পর্যাপ্ত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পাথরডি গাঁয়ের **টেম্পো মুড়ার** কথা। টেম্পো একদা ছিল মান্‌কি সর্দার। প্রয়াত ছো শিল্পীর গম্ভীরের তুতো ভাই। অনেকে মুড়াকে একটা নাচনি রাখতে পরামর্শ দিল, তা হলে ষোল আনার সমাজে কদর হয়। টেম্পো মনস্থির করে এক নাচনিকে শর্ত দিল—যতদিন এই টেম্পোরবশ্য হয়ে থাকবে, আট ডেসিমেল জমি ভোগ দখল করবে। অপর রসিকে মজলে তো শর্ত ফরাল। নাচনি মানেনি শর্ত। টেম্পো বলেছিল উয়ঁ রা যে ভাই - ভাসুর কাঁহাকে মানে না। যে স্থানে যখন পাবেক, রতন মিলব্যে ছুটবেক। সিককে 'নিগুড়ে' লিঁব্যেক। টেম্বো নাচনি রাখেনি, তবুও সে ফকির হয়েছিল। সে ছিল মান্‌কির মাথা। অর্থাৎ মদ - জুয়া আর বাঈ আসর না করলে মর্যাদা বাড়ে না। এক একটি আসরে বসে দশ বিশ শতক মুদ্রা স্রেফ নাচওয়ালির বুকে গুঁজে দিয়ে এক সময় দিগম্বর হয়ে গেল! নেংটি - সার টেম্পোর সঙ্গে দেখা পাথরডি গাঁয়ের মুখটায়। সে এখন স্থনীয় হেল্‌থ সেন্টারের সাফাইওয়ালা।

মাদলার দুলি মাছুয়ার, কিম্বা লাপাংয়ের শুলিয়ার সংসারে সন্তান এসেছিল। ওদের মতে আমরা হলাম শ্রীরাধিকা - কৃষ্ণ। নাচা - গাওনা আমাদিগের সাধন - ভজন। উয়াঁতেই মজলি। রসক্যা যদি সঠিক হয় তাহার নাচনিট একোই পথে চলব্যে। মনটা তাহার রসক্যার প্রতি আটুপাঁটু রঁহিলি, বুঝেছ্য কথাটুকন? বৃন্দাবন সর্দার আরো যা বলে তার সার - সংক্ষেপ হল, সংসার ক্ষেত্রে নাচনি - রসিক হল অগ্নি আর ঘৃত - ভাণ্ডা। একত্রে রঁহিলি ত মিলন হঁথ্যেই লাগবে। সেটাও যে দেবতারই ইচ্ছা। অর্থাৎ বংশ রক্ষার তাগিদে দুলির কোলে যেমন এক কন্যাসন্তান এসেছে, তাকে প্রতিপালন করে বিবাহ দিয়েছে, নাচনি করার কথা ভাবেনি। শুলিয়াও তাই। তার পুত্র কানুনগো সিং সর্দার রসিক হতে চায়নি। কেন চাও না? তার উত্তরে কানুনগো বলেছিলে, এ লাইনে বৃন্দাবন একটাই থাকবে, শশ মাহাত একাধিক পাবেন না। জগৎ কুঁইরি, কার্তিক তন্তুরায় ওঁরা হলেন সব নমস্য রচনাকার। তাঁদের শিল্পী হয়ে উঠতে একটা করে নাচনির প্রয়োজন ছিল। ওঁরা হলেন রসিকের সাজন। এখন তো স্যার খেমটাই সব। মোটা-গোদা রং নাচছে। ছায়াছবির গানের সুরে ঝুমর বাঁধছে। নাচ গানের নামে শুধুই মদ - ফুর্তি।

মেঘের হাল্লা গাই এসে ডাঙা থেকে সবটুকু রোদ তুলে নিয়ে গেল। সারাটা আকাশ মেঘাক্রান্ত। বৃন্দাবন একটানা বচন দিয়ে শারীরিক কারণেই ঝিম মেরেছে। শুলিয়াকে বলি ঝুমরের একটা পদ শোনাও না, কয়েক কলি অন্তত। শুলিয়া লাজুক হেসে বলে কি আর গাহি। সে কণ্ঠ নাই রে বাপু। দমে নষ্ট হঁয়েছে। বাহির ফাটক না কঁরল্যে ইয়াঁরর উজ্জত রহেঁ বল? তবু সে ধরে— 'আজ ফিরে যা রে কালা— কাল সময় বুঝে আসবি— নিতি করনা আনাগনা— পিরিতি যদি রাখবি।' পদ শুনে সর্দার নড়েচড়ে ওঠে। সে পরের কলি ধরতে যায়, কিন্তু শরীরে দাপট পায় না। শুলিয়া মেঘের দিকে নির্দেশ করে বলে দেখছ্য থ আকাশ ঝরলে দমে ভাসাব্যে। তুমরা কুথা ঘুঁরব্যে বাপ্। আমরা যাবো বাগমুণ্ডি। তা হঁল্যে তুরন্ত উঠ। বড় ডাঙা পেঁরাতে হব্যেক। বিদায় নিতে উঠে দাঁড়াই। বৃন্দাবন করজোড়ে থেমে থেমে বলে — এ্যাই যে আসর হঁল্য, গান - তালিম হঁল্য মরে রাখবেন। আর দফায় বেন্দা সর্দারকে পাবেক নাই হেঁ, এই বললাম।

বৃন্দাবনের ভবিষ্যৎবাণী ভ্রান্ত প্রমাণ করতে কয়েক মাসের মধ্যেই গিয়েছিলাম লাপাং গ্রামে। তখন ছিল পৌষ সংক্রান্তির পার্বণ। গ্রামের মানুষ পরবের নেশা খেয়ে টলছে। বৃন্দাবনের খোঁজ করতেই কানুনগো সিং বেরিয়ে এল। সর্দারের একমাত্র অযোগ্য উত্তরাধিকার। রসিক কোথায়? যথেষ্ট শঙ্কিতচিত্তে প্রশ্নটা করি। রসিক! সে একটু থমকায়। আমরা চমকাই। মাঝে তো মাত্রই ক'টা মাস তার মধ্যেই...? কানুনগো মৃদু হেসে বলে বাবা ঘরে আছে। শুলিয়া বেরিয়ে এসে চিনতে পারে। বসতে দেয়। তারপর দাঁড়ান খাটিয়াটা পেতে দিয়ে মা - ছেলে ঘরে ঢুকে যায়। ঘর বলতে ভাঙা তোবড়ানো অন্ধকার কুঠুরি এক। একটু পরেই ওরা ধরে এনে খাটিয়াতে শুইয়ে দিল একটি শরীরের কাঠামো। চমকে উঠে দেখি মেডিকেল ল্যাবরেটারিতে কাচের ঢাকনায় ঝোলান কঙ্কালটি যেন যত্নে রেখে গেল। মুখে বাক্য নাই, চোখে দৃষ্টি নাই, বুক স্পন্দনহীন, প্রত্যঙ্গ অসাড়। এ যেন সর্দারের বাসি লাশ আগলে বসে থাকা! কানুনগো বলে বাবার ক্ষয় রোগ ধরেছে। বাঁচবে না, দেখছেন তো। যে কটা দিন...। কোন কথাই আমার কানে যায় না। মনে বাজে সেই খেদোক্তি, পরের দফায় বেন্দাবনকে পাবেক নাই। আর এই যে কয়েক খণ্ড অস্থি সামনে পড়ে আছে, যার আড়ালে প্রাণ নামক সেই অমোঘ বিহঙ্গটি এখনও জেগে আছে, সে যে অলক্ষ্যে খাঁচা খুলে ফেলেছে, এবারে উড়ানের অপেক্ষা মাত্র! তারপর চামড়ার নরম চাদর খেয়ে নেবে আগুন। পাটের খড়ির মত অস্তিগুলি মড়মড় ভেঙে দুমড়ে মিহিন ভস্ম হয়ে মিলিয়ে যাবে মানুভূমের প্রান্তরে, রসিক বৃন্দাবন। লাপাংয়ের ধু-ধু মাঠ জুড়ে তার নাচনির কান্না ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। মানভূমের মরুতে প্রেম সিঞ্চনে যে ফুলটিকে ফুটিয়েছিল সর্দার, তাকে আগলে রেখেছিল লাঠিবাজের রোষ থেকে, তাকেই একলা করে দিয়ে নিজের প্রস্থান পর্ব নিজেই রচনা করেছে দেখি। সে যে এক আ-কণ্ঠ শিল্পী!

আমরা ফিরে চলি। খাটিয়াতে পড়ে থাকে বৃন্দাবনের চোয়াল, করোটি, পাঁজর - পিঞ্জর, কটি তট, লৌহ শলার মত শীর্ণ আঙ্গুলগুলি জুড়ে জুড়ে একটা কাঠামো। তার চোখে অশ্রু ধারা। খাটিয়ার এক পাশে কানুনগো সর্দার, অপর পাশে নত মুখে অতীতের নাগ - কন্যা। চল্লিশ বছরের একটি জোড়া ভাঙনের মুখে। আর কয়েক ক্ষণ মাত্র!

মদনে দহনে হায়! কি করি উপায়

বিরামডি স্টেশনে লেভেল ক্রসিং পেরিয়েই গেটম্যানকে শুধোই যুগিডি গ্রামের হদি–। ব্যক্তিটি পাল্টা প্রশ্ন রকরে, কাঁহার ঘরকে খুঁজছ্যেন? তুমি চিনবে? ইদিকে যত গাঁ সক্কল চেনা। আপনি বলেন। চল্লিশ বৎসর গেট পাহারা, ওমনি? যুগিডির রাজবালা, চেন? সে সন্ধানী চোখে তাকায়। বলে, উয়াঁ নাচনি বটে। হ্যাঁ। রসিকটা কার্তিক, ঠিক বট্যে? হতে পারে। এবারে গেটম্যান হাসে। বলে নাচনির নামট মনে রাঁখেছ্যেন রসক্যাটি চিনেন নাই। উয়াঁকে বায়না ধরা হব্যে? দেখি। মাঠের মধ্যে রেলের গেট পাহারায় থাকে এই ব্যক্তি। একলা - জীবন মানুষের এই এক ব্যায়রাম। কাউকে বাগে পেলেই গল্প জুড়তে খড়কুটার মত আঁকড়ে ধরে। সে বলে আপনারা কুথা হঁথ্যে আঁসছেন, পুরলিয়া ত বোধ হচ্ছেন নাই। দূর শহরের, ঠিক বটে? তা তো হল। বলো কি ভাবে যাবো? সে বোঝায় এই ব্রহ্মডাঙা ধরে টানা যাওয়া। এ পথে শুধুই মাঠ। একটা গ্রাম আছে আগে। তাকে পেরিয়ে মালভূমির বুকের মধ্যে ছোট্ট গ্রাম যুগিডি। পথ হারাবার কোন উপায় নাই। আমরা গাড়িতে চড়ে বসি। সময়টা ছিল শীতের মাঝ বরাবর। এ সময়টা পুরলিয়ার উষর প্রান্তর ধরে চলতে বেশ মনোরম। রোদ চড়া হলেও মিঠে বাতাস আছে, আর সামনে শূন্য প্রান্তর ছড়ানো আকাশের প্রান্ত জুড়ে। প্রায় বারো মাইল ছুটে যুগিডিতে এসে খোঁজ খবর করতে গিয়ে একজন বলে ওঃ! রাজবালা? কার্তিকের নাচনি ট? উয়াঁর ঘর গাঁয়ের পিছে। ঘরে আছে কার্তিক? নাই জানলি। ঢুঁড়ে দেখেন। তার কুঁড়েটা পাওয়া গেল, কিন্তু শিক্‌লি টানা। কী ব্যাপার হে? কেউ বলতে পারে না। ঘরে তালা নেই, ফলে কাছে কোথাও? একটি স্ত্রীলোক হেসে বলেন, রসিকের ঘরকে আছেটা কি যে তালা মারবে? কার্তিকের সম্পদ বলতে রাজবালা। উয়াঁরা কুঞ্জবনে যেঁছে গ। লীলা করথে। তুমাদের কী দরকার? আছে একটু। যাও তাহলে কুঞ্জবনে। স্ত্রীলোকের হেঁয়ালি বোঝা কষ্টসাধ্য। আমরা ফিরে চলি।

বিরামডি রেল গেটে আবার ধরে গেটম্যানটি, কি পেলেন না তো? কী করে জানলে? সে হেসে বলে উয়াঁকে ধরে রাঁখেছি যে, আমি জানব নাই? এ লোকও দেখি হেঁয়ালি করে। গাড়ি চালু করতেই সে বলে কথা শুনবেন তো। তোমার কথা শুনতে আমাদের সময় নেই বাপু। সে বলে আপনারে জন্য কথা বলা করলাম। আপনারা ফিরছেন? কোথায় ওরা? গাড়ি থামাই। নাই। সে যা বলে— ওরা চলেছে টামনা, গোঁসাই আশ্রমে। ট্রেন ধরতে বিরামডি স্টেশনে পৌঁছে গেছে। ওদের বলেছি বড় পার্টি তোমাদের খুঁজছে। ওরা চারশো ঊনচল্লিশ ডাউন ধরবে। ট্রেনের সময় জানা নেই। আমরা ওকে শুকনো ধন্যবাদ ছুড়ে দিয়ে গাড়ি ছোটাই বিরামডি রেল স্টেশনে।

ছোট্ট স্টেশান বিরামডি। নীচু প্ল্যাটফর্ম মোরাম ঢালা। খুদে এক টিকিট ঘর লাল রং টানা, টিনের শেড এ যাত্রী ঘর। খর্ব ওভার ব্রিজ কাঠের। মালগাড়ি চলে আকরিক লোহা নিয়ে, আর গোটা কত লোকাল ট্রেন থামে সারাদিনে। ফলে খাঁ - খাঁ প্ল্যাটফর্ম। দুজন বসে আছে দেখি। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কার্তিক তন্তুবায় হেসে বলে, বড়ই শ্রম হল দাদাদের। যদি জানতেন অতখানি যেতে হত না। সেই জানাটাই যে অজানা ছিল কার্তিক। কষ্ট না করলে এই জোড়া মূর্তি পেতাম কোথায় বলো হে, এমন নির্জনে। চারিদিকে রক্তমাখা টাঁড়ের মাটি। আর কুঞ্জবন ফলে নিধুবনে কি মনে? রাজবালা হেসে বলে কিস্টো দর্শনে। কার্তিকও হাসে। সে বলে এ কিস্টোটির কেশে পাক লাঁগেছে। মনটাতেও পাক। রসের নহরে ডাঁটির টান ধরেছ্য, আমি বঁললি রাজ্যে তু অপর কাঁহাকে ধর। রাজবালার বচনে কোন আড়াল নাই। বলে আমার কিস্টোট কথা কষ্ট কঁর্য্যে আঁসেছ্যে দেখ। পেলাটফরমে সিমল বৃক্ষটির নীচে ডাঁড়াএ আছেন। শুধু মুরলীট নাই। কার্তিক আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে দাদা আপনার রাধিকাকে বুঝে লিঁবেন এবারে। আমি বলি আলাপের সূত্রপাতটা তো ভালোই হল। কার্তিক বলে বলেন কী প্রয়োজন? প্রয়োজন স্রেফ গল্প করা। তাহার জন্য এত! হ্যাঁ তাহারই জন্য। ওরা দুজনে হাসে, বলে পাগল বটে আপনারা। পাগল কি তোমরাই কম। দুটো জীবন এক করে সারাটা পথ চলছো। গাঁয়ে দেখলাম পাড়া থেকে পৃথক করে রেখেছে। মোদের কোন দিক্ নাই। কার্তিক হাসে। বলে আমার জগৎ ত আর বড় মহাশয়। ওটুকন পাড়াতে পুঁরাবেক নাই। দুনিয়াখানা রসক্যা নাচনির দখলে। সে রাজবালার দিকে তাগিয়ে হাসে। তো এই পাগলীকে জোটালে কোথা থেকে? তামাম মানভূম ঢুঁড়ে দেখব্যেন কত রসিক নাচনি রঁহেছ্যেন। ডুমরি গাঁয়ের পোস্তবালা, উয়ঁরে রসক্যা বিজয় কর্মকার। কুমড়াসোলের সোঁদরি, রসক্যা হঁচ্ছেন জনার্দন সিং মুড়া। শিরকাবাদের ফুলমণিকে রাঁখছেন জলধর মাহাত। কেহ কাঁহাকে জুটায় নাই। উপারয়ালা আপন হস্তে বাঁধেছেন রশি। তাহাই বন্ধন হল। সে তো বুঝলাম। তার পিছনেও যে একটা গল্প থাকে।

হ্যাঁ, গল্প একটু থাকে। যেমন ছিল দুলি মাছুয়ার, শুলিয়ার। তেমনই ছিল রাজবালা ওরফে আক্‌লি তন্তুবায়ের। চোড়দা গাঁয়ের বাবা মায়ের এগার সন্তানের নয় পুত্রের সকলেই গত হয়েছে। দুই কন্যার বড়টি **সুলোচনা** ছিল নাচনি, আর ছোট রাজবালার বিবাহ হয়েছিল রথটাঁড়ের মুচিরামের সঙ্গে, মাত্র ষোল বছর বয়সে। মুচিরাম শুরু থেকেই ছিল রুগ্ন। কুষ্ঠাক্রান্ত। রাজবালা ওর ঘর করতে চায়নি। একদিন বাঘমুন্ডির হাটে সুলোচনা ধরল কার্তিককে। বলে 'কূটগ্রস্থ' মানুষের সঙ্গে সারাটা জীবন বিতাবে না আমার বোন। তুমার বনকে পুঁছতাছ কর, যদি রাজি হয়। সেই কার্তিক আর রাজবালা একজোড়া রসিক - নাচনি যুগিডির বুকে এসে নীড় বাঁধলো। বাপের ঘর - সংসার এবং সম্পর্ক ছুটি করে আকলি তন্তুরায় পুরোপুরি রাজবালা হয়ে চলে গেল কার্তিকের ঘরে। নিকট স্বজন সব ধূসর হয়ে গেল। সামনে শুধু অনিশ্চিত এক ভুখণ্ড ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রা। যে যাত্রা বৈভব কিংবা সচ্ছলতার অথবা নিরাপদের না হলেও, সুখের বটে। রসিকের অর্থ - সম্পদের যে নাচনির ভরণপোষণ, আবার নাচনির সফলতায় রসিকের উপার্জন। দুইয়ে টান পড়লে এক ভয়ঙ্কর খাদের মুখে এসে দাঁড়ায় দুটি জীবন। তারপর মরণ - ঝাঁপ। এভাবেই টাঁড় প্রান্তরে ফুলগুলি ফোটে, শুকোয়। তবুও কেন নাচনি - রসিক? সে জীবনের মুখটা কোথায়? রাজবালা বলে সে কথা বুঝথে লারবে। নাচা - গান - বাহির ফাটক, মান্‌সের ভাললাগা, ভালবাসা, রসিক

- সাজনের পিরিতি আগুনে যে পুড়েছ্যে সে লঁক বুঝথে পারবেক। তাহার মধ্যে দুটা মাড় - ভাত জুটান। রসক্যার ঘরে স্ত্রী লোক থাকলে নাচনির জীবনে লাঞ্ছনার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। কার্তিকের ঘরে সে সঙ্কট ছিল না। এ রসক্যা কৃষ্ণ পরায়ণ ব্যক্তি। আমি নাচি, রসক্যা গায়, বাজায়। দুজনা রস-মদ খাই। আখড়া করতে যাওয়া হলে টুকু লাজ বতর ঘুচাতেই লাগবে। জনগণ সকলে সহবত জানে না। সেসব মানতে হয়। ওদের ঘরে কন্যা জন্ম নিল, জবা। নয় ক্লাশ পাশ দিল জবা। পাল্টি ঘর দেখে বিয়ে হল। মা সর্দার বংশ, বাপ কুর্মি ঘর। জামাই হলধর মাহাত ফরেস্ট গার্ড। মেয়েভি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। নাচনির মেয়ে নাচনি নয় কেন? রাজবালা বলে এই জীবনের তাপ সকলে নিতে পারবে না। দেখছ না? আবার সেই একই ধন্দ তবে যে বললে সুখ? কার্তিক বলে ঠিকই বলা হয়েছে। প্রেমে সুখ। উঁয়াতে বাঁধা হল জীভন তরী, কিন্তু সকলে বুঝবে নাই। মানবেক নাই, দুখ পাবে। তোমার দুঃখ নাই? আছে। মন দুখালে দুখ পাই, না দুখালে ভী দুখ পাই। কষ্টেই ইষ্ট রঁহেন যে। বাঃ বেশ বলেছ। তার মানে ভিতরের কষ্টকে জীইয়ে রাখা। যা বুঝবেন। সে নরম করে একটা ঝুমুর ধরে নরোত্তম দাসের— 'গত নিশি কোথা ছিলে, কার মনঃস্কাম পুরাইলে/ বঁধু হে এখন আইলে কিবা কাজে/ ফিরে যাও হে কাল শশী যার কুঞ্জে পোহালে নিশি/ ছি ছি বঁধু লাজ নাহি মনে!' কার্তিক ভাবের ঘরে ঢুকেছে। সে থেমে থেমে বলে পিরিত জীবনের বিশিষ্ট সম্পদ মহাশয়। তাহাকে তাঁড়্যে (খুঁড়ে) নিথে হয়। তাঁড়ত্যে জানলে দেখবেন সুখ-দুখ কন অন্তর নাই। সুখে ভী আন্দ, দুখে ভী আনন্দ। পিরিত বড় সম্পদ বাবা হে! যতন পালে ফুঁরাবেক নাই। জীবন তো নদী পারা, সদাই বহেন, তাহাকে ভাসছ্যে প্রেমের তরণী। ঝড় প্রলয় থাকব্যে, নদী উথলাবে। তরণী ডুবন্ত হল্যে গভীর যন্ত্রণা। পরস্পর বুঝাবুঝির ফারাক হঁল্যে তরণী ডুবল। নাচনি এক রসক্যার ঘর ভাঙে অপর রসকার মজল। ইহাই দুনিয়ার রগড়।

রাজবালা প্রসঙ্গ বদলায়। বুঝতে পারে কার্তিক ভাবের ঘরে গেলে মনটা তার বার হবে। দিনটাই ঝুম হয়ে থাকবে। সে বলে এই যে দেখছ্য আমার জন্য রসক্যাট জীভন বিতাঁল, সমসার ধরল নাই, জাইতালু বিহা নাই আমার ভা টুকন করার থাকল উয়াঁকে সুখ দিতে। আমার যাহা উপার্জন উয়াঁর প্রাপ্য। এই প্রকার সমঝাদারি না হলেঁ রসক্যার মন ছুটাবে। দুরসা নাচনি টুঁড়ব্যে। কার্তিক বলে —নাচনিকে রাখা করতে দমে খরচ। মদ-জল, মাংস-মৎস্য, বস্ত্র, প্রসাধন, অলঙ্কার, তেল, সাবান - শ্যাম্পু। নাচনির দেখন শোভন না হল্যেঁ জনগণ লিঁবেক নাই। তাহার শরীর রাখা লাগবে। আর সেই খরচের দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে রসিক তার ভিটে - মাটি, জমি-বলদ খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে।

রাজবালার নাচগানের তালিম শুরু থেকেই ছিল। কার্তিক তাকে ঘরে এনে ওস্তাদের হাতে তুলে দিল। কামতাজামদা গাঁয়ের দুঃখভঞ্জন মহান্তির হাতে পালিশ পড়ল। ছোট ছোট আসর ধরল কার্তিক অল্প দিনেই নাম ছড়াল রাজবালার। তখন মান্কিরা ডাকে, রাজা আসর দেয়। বড়াস, কড়েং, সুইসা, রাজখরসোঁয়া, মানবাজার কত প্রান্তের নাচনি আসছে আসরে। তাদের মধ্যে দাঁড়াতে হবে, তবে অন্যত্র বায়নার ডাক পাওয়া। বেঁচে থাকার উপায়, মান - মর্যাদার এক একটা সিঁড়ি এই আসর। দেড়হাজারি একটা বায়না থেকে বাজনদার বাদে বাকি টাকায় নিজেদের সংসার, বাহির খরচ, রস পান সব ব্যবস্থা। হিন্দুদের পুজো পার্বণ, বিয়ের বাড়ি, অনুষ্ঠান সবেতেই নাচনি নাচ অপরিহার্য— রাজবালা বলে বিদ্রিতে দুর্গাপুজোয় টানা একুশ বছর নেচেছি। নাচতে গেছি কাশীপুরের রাজবাড়িতে, উরমা, সম্বলপুর, কটক, রাঁচি। নাচতে গিয়ে সম্ভ্রম খোয়াতে হয়েছে? রাজবালা এবার সতর্ক হয়, হাসে, একটু থেমে বলে নাচনির ত ইজ্জত আছে। উয়াঁরা ঢোল ধমসার ধ্রুপদী নাচনদার। তথাপি পাঁচ লক দেখবে, শুনবে, গান বাজনা নাচ দেখে ইজ্জত দেবে। উয়াঁদের টুকু রং তামাশা মানতেই লাগবে। বুকে টাকা গুঁজবে। সবেই সখাভাবে লিঁথে হয়। না হঁল্যে নাচনির ভূমি উচ্ছেদ। সারারাত মানুষ যে জেগে বসে আছে, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনে ছুঁৎ-ছুঁৎ থাকলে চলব্যেক নাই। তার জন্যে ঘরে বৈঠক করতে হয়। বরজুরাম, দীনা তাঁতি, পীতাম্বর, ভবপ্রীতা, নরোত্তম, রাসকিষ্ট মহান উস্তাদ। রাজবালা করজোড়ে প্রণাম করে। বলে, আমার রসক্যাটিও পদ লিখেন, গাহেন। বেলা ডোবা থেকে গহীন রাত তক্ নাচ গানের রেওয়াজ চলে নাচনির ঘরে। কার্তিক বলে রসিক-নাচনি সকলেই হবে না মহাশয়। যাহার অন্তরে রসের ধারা বহমান, ব্যাসদেব উয়াঁকেই কল্মা প্রদান করেছ্যেন। বর্তমানে রাজা, মান্কি, জমিনদার তলনামি হঁল্য, নাচনির দমে বাঈ - খেমটায় নাম তুল্য।

একালের বিত্তবানের চেহারা পৃথক। জমি যার আছে, সে এখন কোঠা বাড়ি করে, সন্তানকে শিক্ষিত করে তুলে, নিজে সমাজের কেষ্টবিষ্টু হতে রাজনীতির খাতায় নাম লেখায়। তাদের নাচনি রোগ নাই। আর প্রেমের রসে মজে থাকা মানুষগুলো গেঁল্য কুথাকে বাপ! রাজবালা সুধায় কার্তিককে। হুঁ গ বল না, মানুষগুলা গেঁল্য কুথা— শশ মাহাত, বেন্দাবন সর্দার, ক্ষেপা সিং, বুধন সিং মুড়া, কঁকা তন্তুরায়। কার্তিক হাসে। বলে সময় এক প্রকারে রঁহে না। এই দেখ্ দুফুরে বলেছি গল্ফ করত্যে এখন গগন দেপ্তা পাটে বসেছেন। বিকাল ফুঁরাঞে আসছ্যে। সময় ভী ফুরাচ্ছেন। গভীর অন্তরের বচন। তাকিয়ে দেখি স্তব্ধ স্টেশান চত্বরে কিছু মানুষের ভিড় জমেছে। পশ্চিম প্রান্তে সূর্য পাটে বসেছে। গভীর লাল দিগন্ত। ক্রমশ ফেড আউট হয়ে যাচ্ছে দুটি মুখ। আমাদের ছবিওয়ালা একই ফ্রেমে ধরতে চেষ্টা করে মুখ দুটি। আমি তাড়া দিই —জল্দি করো, আলো ফুরিয়ে আসছে। ওদিকে রেলের ঘোষণা হল— চারশো উনচল্লিশ ডাউন কাঁটাডি ছেড়েছে। আমাদের সামনের বিগ্রহ দুটি নড়েচড়ে ওঠে। ওরা যাবে নিমডির কুঞ্জ নগরে। সেখানে বোস্টম আখড়ায় রাতের ভাণ্ডারা।